কালের কণ্ঠ ৩১.০১.১৮

ঢাকাকে বাসোপযোগী করতে সিটি করপোরেশন নিয়ে কিছু ভাবনা

ঢাকা দুবাই নগরীর মতো নতুন নয়। এই ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক নগরীকে বাসোপযোগী করতে হলে বহুবিধ ব্যবস্থা নিতে হবে। হতে হবে সবদিক থেকে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতে হবে এর সব প্রকল্প। গ্রহণ করতে হবে যুগোপযোগী নিতানতুন সাহসী পদক্ষেপ

যদিও ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর বয়স হয়েছে ৪০০ বছরের বেশি, তবুও বিশ্বে এখন অনেকেই এটাকে বসবাসের অযোগ্য মনে করে। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহানগরীর র‌্যাংকিংয়ে ঢাকার অবস্থান একেবারেই নিচের দিকে। নেহাত বাধ্য না হলে কেউ এ নগরীতে আজকাল আসতে চায় না। তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে—অসহনীয় যানজট, উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব। এখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় কেটে যায় জীবনের একটা মূল্যবান সময়। অপচয় হচ্ছে জ্বালানির মতো আমদানি করা দুর্মূল্য সম্পদের। কোনো কারণে উত্তরা থেকে ধানমণ্ডি কিংবা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় যেতে হলে দিনের একটা বিশেষ অংশ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। তারপর রয়েছে ফুটপাতজুড়ে দোকানপাট, বিশৃঙ্খলা ও অপরিচ্ছন্নতা। স্থানীয় নাগরিকদের পানীয়জলের সংকট থেকে শুরু করে গ্যাস, বিদ্যুৎসহ নর্দমা পরিষ্কার ও পয়োনিষ্কাশনের সমস্যা। স্বাধীনতার পর অর্থাৎ বিগত ৪৬ বছরে রাজধানী নগরী ঢাকা যে অপরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং বেড়েছে জনসংখ্যা, সেভাবে নেওয়া হয়নি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখলের জন্য যে পরিমাণ ষড়যন্ত্র কিংবা চক্রান্ত করা হয়েছে, দেশের কিংবা বিশেষ করে রাজধানী উন্নয়নের জন্য সে পরিমাণ পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। ঢাকার কিছু কিছু অংশ বাদ দিলে সমস্ত নগরীকে কখনো কখনো মনে হয় অত্যন্ত বিভীষিকাময়। আবর্জনাপূর্ণ পূতি দুর্গন্ধময় ও বিশৃঙ্খলাতাড়িত। তদুপরি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা আর শুকনো মৌসুমে ধূলি ধূসরিত অবস্থা। সে কারণে ঢাকায় বিদেশ থেকে এখন কেউ বেড়াতে আসা দূরে থাকুক, অতি প্রয়োজনীয় কাজেও অনেকে আসতে চায় না। মোগল শাসনের পর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে।

নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে পাকিস্তান আমলের ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে (ডিআইটি) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (রাজউক) রূপান্তরিত করা হয়েছিল। তাতে নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা কিংবা সীমানা নির্ধারণে যে পরিমাণ সময় ব্যয় করা হয়েছে, সে পরিমাণ উন্নয়নের কাজে হয়নি। তা ছাড়া সে সময়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলররা যথেষ্ট সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করতে এলেও অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় কাজের ধারা কাঙ্ক্ষিতভাবে গতি লাভ করতে পারেনি। এ নগরীর নিজস্ব আয় ও সংগতি বৃদ্ধিকল্পে পরবর্তী পর্যায়ে 'নগর সরকারের' দাবি উঠলেও রাজনৈতিক দলগুলো রাজধানীতে তাদের কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে তাকে খুব একটা বিবেচনায় নেয়নি। ফলে লন্ডন, প্যারিস কিংবা নিউ ইয়র্কের মতো ঢাকা মহানগরী হিসেবে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। অধিকন্তু বেসরকারি পর্যায়ে অপরিকল্পিতভাবে যেসব ভবন বা দালানকোঠা নির্মিত হয়েছে, সেগুলো বৃহত্তরভাবে নগর পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করেছে। প্রয়োজনীয় খাল, জলাশয় এবং এমনকি এক চিলতে খোলা মাঠও ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী বাসস্থান ও দোকানপাট। শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়, সারা দেশেই অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে হাটবাজারসহ বিভিন্ন স্থাপনা। দৃশ্যত সে জন্য কোনো আইনি অনুমতি লাগে না। মনে হয়, এগুলো নিয়ে সরকারি পর্যায়ে চিন্তাভাবনা করারও প্রয়োজনীয় কিংবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনো মানুষ নেই। কোনো থিংকট্যাংক নেই। স্থানীয় সরকার কিংবা সিটি করপোরেশনের নেই কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কিংবা বিশেষ বাজেট। তা ছাড়া সিটি করপোরেশন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা খুবই সীমিত। এর সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন নগরগুলোতে। এ অবস্থায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া গেলেও সড়ক ও পরিবহনব্যবস্থা এবং যানজট সমস্যার তেমন কোনো সন্তোষজনক সমাধান এখনো হয়নি। নগরীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বে নির্মিত উড়াল সড়কগুলো এখানে-সেখানে তীব্র যানজটকে কিছুটা লাঘব করলেও মূল সমস্যা তেমনই রয়ে গেছে। অর্থাৎ ঢাকা নগরীতে চলাচল সহনীয় পর্যায়ে কবে আসবে তা কেউ জানে না। প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও চাপের মুখেও 'এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে' এবং মেট্রো রেলের কাজ তেমন একটা যেন গতি পাচ্ছে না। তদুপরি উল্লিখিত দুটি ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান নগরীর একটি অংশের যানজট নিরসন কিংবা তীব্র পরিবহন সংকট কিছুটা লাঘব করলেও অন্যান্য এলাকার জন্য (দক্ষিণ-পশ্চিম) নেই কোনো যুগপৎ পরিকল্পনা বা উদ্যোগ। অথচ এ মহানগরীতে দিন দিনই যেন জনসংখ্যা ধারণাতীত হারে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হয়, ঢাকার বাইরে আর বাংলাদেশ নেই। কর্মসংস্থানের আর কোনো ব্যবস্থা নেই এ দেশে।

এ রাজধানী অর্থাৎ ঢাকা নগরীর বাসিন্দা হিসেবে ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো আমাদের অত্যন্ত পীড়া দেয়। আরো বেদনা দেয় তাঁদের, যাঁরা বিভিন্ন পেশাগত কারণে ঘন ঘন কিংবা মাঝেমধ্যে বিদেশ সফর করেন। দেশে ফিরে এলে প্রথমেই যেটা মনে হয়—এখানে যেন অনিয়মগুলোই নিয়ম হয়ে গেছে। এখানে কর্তৃপক্ষই যেন প্রতিনিয়ত জনগণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এখানে নগরীর জনাকীর্ণ অঞ্চলে আয়োজন করা হয় বাণিজ্য কিংবা শিল্প মেলা, পার্কে আয়োজন করা হয় জনসভা, রাস্তায় গণজমায়েত। উত্তরার টঙ্গী প্রান্তে আয়োজিত বিশ্ব ইজতেমা বছরের একটা সময়ে সে অঞ্চলে চলাচল দুঃসাধ্য করে তোলে। এসব কি নগরীর বাইরে কিংবা শহরতলিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না? সেসব কারণে এই মহানগরী প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। এখানে কোনো হৃদরোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যায় রাস্তায়, যানজটের কারণে। তা ছাড়া একটা সময় ছিল রাজনীতির নামে লাগাতার ধর্মঘট, জঙ্গি হামলা ও যাত্রীবাহী বাসে বোমা নিক্ষেপ করা। অস্থিতিশীলতা, বিশৃঙ্খলা, যানজট ও অনিয়মের এ নগরীতে তাই মানুষ আসতে ভরসা পায় না। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করলেও রাজধানী নগরী ঢাকার নাম কোথাও বিশেষ উল্লেখ করা হয় না। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু ক্রিকেটের বেলায়। ঢাকার অতিথিপরায়ণ ও ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ একদিকে যান চলাচল বন্ধ রেখে বিদেশি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মাঠে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে দীর্ঘ সময় যাত্রীদের অবরুদ্ধ রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়। বিশ্বে বা আন্তর্জাতিকভাবে ঢাকার গুরুত্ব এতই কম যে বিদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ুর খবরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল কিংবা আফ্রিকার অতি ক্ষুদ্র কোনো রাজধানী নগরীর নাম উল্লেখ করা হলেও ঢাকা নগরীর কোনো উল্লেখ থাকে না। তার পরও এই ঐতিহাসিক মহানগরীকে নিয়ে এ দেশের মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখে। তারা এ মহানগরীকে টেনে তুলতে আগ্রহী বিশ্বের প্রথম কাতারের উন্নত রাজধানীর সারিতে।

ঢাকার নাগরিক জীবনে দুঃসহ এ পরিস্থিতিতেও নগরীর উত্তর সিটি করপোরেশনের পরলোকগত মেয়র আনিসুল হক বিরাজিত সব সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, অল্প সময়ের মধ্যে কিছু কাজ করে বেশ কিছু স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নগরবাসীকে। আনিস সাহেবের অভাবিত মৃত্যুর পর নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে মাঠে নেমেছিলেন ঢাকার ব্যবসায়ী নেতা আতিকুল ইসলাম। তিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সবুজসংকেত পেয়েই গণসংযোগ শুরু করেছিলেন এই মহানগরীর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবশালী মানুষের মধ্যে। এর মধ্যে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল আরেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আবদুল আউয়াল মিন্টুর তরুণ ছেলে তাবিথ আউয়ালকে। তাবিথ আনিসুল হকের বিরুদ্ধে তিন লক্ষাধিক ভোট পেয়েছিলেন গত নির্বাচনে। কিন্তু দলীয় এক সিদ্ধান্তের ফলে নির্বাচনের দিন দুপুর নাগাদই তিনি নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। সে নির্বাচনে জালভোট প্রদান ও বল প্রয়োগ থেকে এমন কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় নেই, যা সংঘটিত হয়নি। উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে ভোট দিতে গিয়ে শুনি ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে এবং আমাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে জন্য আনিস সাহেবকে দায়ী করা যায় না। কারণ তিনি কোথাও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন না। ঠুঁটো জগন্নাথ অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন সেবার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে।

নির্বাচনের ব্যাপারে সে আস্থার সংকট এখনো রয়ে গেছে। লন্ডন থেকে জানুয়ারির শুরুতে ঢাকা ফিরে এসে দেখি, সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে তেমন একটা হৈচৈ নেই। তবে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণার কিছুটা আগে থেকে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রার্থী বাছাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে মেয়র পদে ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম ও তাবিথ আউয়ালের নামই শোনা যাচ্ছিল প্রথম থেকে। মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে তাঁরা নিজেরাও প্রথম থেকে বেশ নিশ্চিত ছিলেন। মেয়র পদপ্রার্থীর তুলনায় কাউন্সিলরের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সম্ভাব্য কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের জনপ্রিয় মেয়র পদপ্রার্থীদের কেন্দ্র করে ভিড় জমাতে দেখা গেছে আগে থেকেই। সত্যিকারভাবে অর্থাৎ প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে মেয়র পদপ্রার্থীদেরও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। কারণ সমস্যাসংকুল ঢাকা মহানগরীর বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার এক দলের আর মেয়র অন্য দলের হলে উন্নয়নের লক্ষ্যে তহবিল বরাদ্দ নিয়ে অনেক সমস্যা হতে পারে। এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়। অনেকে মনে করেন, মহানগরীতে বিএনপির প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্যই একপর্যায়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাংবিধানিকভাবে সেটি কি ন্যায়সংগত হয়েছে? ঢাকা নগরী বাংলাদেশের রাজধানী। তা ছাড়া এ মহানগরীর সংবিধানসম্মতভাবে একটিই সিটি করপোরেশন ছিল। এ ব্যাপারে সাবেক মেয়র (অবিভক্ত করপোরেশনের) হাইকোর্টে একটি রিট করেছিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট সে ব্যাপারে সরকারকে (সম্ভবত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে) জবাবদিহি করার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ নগরীর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বার্থে বিভক্তিকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তবে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ঢাকা মহানগরীসহ অন্যান্য নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক সময় কর্তৃপক্ষই বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় সরকারের ভিত্তি কিংবা শক্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্তে তাকে দুর্বল করে রাখাই যেন বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে লন্ডন, প্যারিস বা নিউ ইয়র্ক সিটি করপোরেশনের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক আয় বা ভিত্তি অনেক শক্তিশালী। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের ওপর খুব কমই নির্ভর করে। স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় কাউন্টি কাউন্সিল ও বারা কাউন্সিলগুলো নিজের আয় থেকেই রাস্তাঘাট উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং এমনকি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের খরচ বহন করে থাকে। আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় যথেষ্ট আইনি ক্ষমতা সিটি করপোরেশনগুলোকে দেওয়া হয়নি। সরকার রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে একাই সব কিছু করতে চায়। এ অভিযোগ নগরবাসী অনেকের। ঢাকায় পৌঁছেই শুনলাম, মেয়র পদপ্রার্থী আতিকুল ইসলাম বলছেন, তিনি নির্বাচিত হলে ঢাকাকে একটি বৈঠকখানার মতো সাজিয়ে তুলবেন। এ কথাটি অবশ্যই বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

কারণ ঢাকা মহানগরী নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে কিছুই আমরা জানি না। আতিকুল ইসলাম, তাবিথ আউয়াল কিংবা অন্যান্য মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে সম্ভবত কেউ নগর উন্নয়ন কিংবা নগর পরিকল্পনাবিদ নন। পরলোকগত আনিসুল হকও তা ছিলেন না। তবুও তাঁরা সবাই অত্যন্ত সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করতে আসেন। কিন্তু আজকের ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য চাই একটি সমন্বিত মহাপরিকল্পনা। রাজউকের বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার আশপাশের অঞ্চল নিয়ে যে বৃহত্তর ঢাকা নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা অতীতের তুলনায় বিশাল। রাজউকের পরিকল্পনা মোতাবেক যেসব নতুন নতুন নিকটবর্তী এলাকায় উন্নয়ন করা হবে, তা ক্রমে ক্রমে ঢাকা সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে। অন্তর্ভুক্ত নিতানতুন এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ করা থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা সিটি করপোরেশনেরই দায়িত্ব হবে। তার জন্যও প্রয়োজন হবে বর্ধিত বাজেট। সে কারণেই সিটি করপোরেশনের আয় বাড়াতে হলে তাকে আইনিভাবেই অত্যন্ত শক্তিশালী করতে হবে। লন্ডনের সিটি করপোরেশন এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছে, নগরীতে বাড়িঘরসহ যত সম্পত্তি বেচাকেনা হবে—তার স্ট্যাম্প ডিউটি সিটি করপোরেশনের কাছে ছেড়ে দিতে হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট আয়। এমন আয়ের উৎস সিটি করপোরেশনের অনেক রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক আয় বৃদ্ধি ও স্থানীয় সরকারগতভাবে আইনি ক্ষমতা জোরদার করতে হলে সিটি করপোরেশনগুলোয় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। এ বিষয়টি সরকারের সঙ্গে বৃহত্তর সমঝোতা ও ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে। নতুবা বর্তমান ব্যবস্থায় সিটি করপোরেশনের অধীনে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আশা করা যাবে না।

ঢাকা দুবাই নগরীর মতো নতুন নয়। এই ৪০০ বছরের পুরনো ঐতিহাসিক নগরীকে বাসোপযোগী করতে হলে বহুবিধ ব্যবস্থা নিতে হবে। হতে হবে সবদিক থেকে সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতে হবে এর সব প্রকল্প। গ্রহণ করতে হবে যুগোপযোগী নিতানতুন সাহসী পদক্ষেপ। সাংবিধানিকভাবে আনতে হবে প্রয়োজনীয় সংস্কার। তার জন্য প্রত্যেককে তৈরি হতে হবে। স্লোগান দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে নিজেদের যোগ্যতা। ভবিষ্যতে সবাই মিলে নিশ্চিত করতে হবে কারচুপিমুক্ত একটি অবাধ ও সুষ্ঠু সিটি করপোরেশন নির্বাচন। তার পরের চ্যালেঞ্জ হবে ঢাকাকে বাসোপযোগী একটি আধুনিক মহানগরী হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সম্ভব হলে একটি সময়োপযোগী 'নগর সরকার' প্রতিষ্ঠা করে এর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস)
সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gazulhkhan@gmail.com